উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ত্রিংশতিতম সমাবর্ত্তন

দীক্ষান্ত ভাষণ

অমিয় কুমার বাগ্‌চী

রাজা রামমোহনপুর
২৪শে মার্চ, ১৯৯৮

সামাজিক মানুষের শিক্ষার আবশ্যিকতা ও তার অন্তরায়

অমিয় কুমার বাগ্‌চী

আমাদের জানা পৃথিবীর জীবগোষ্ঠীর আর্বিভাব হয়েছে প্রাকৃতিক বিবর্তনের খেলায়। মানবজাতির-ও উদ্‌ভব ঘটেছে সেই একই বিবর্তনের প্রক্রিয়ায়। অন্য জীবের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য শুধু তার আকৃতিতে নয়, তার প্রকৃতিতেও। ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকে মানুষ-মানুষী তাদের প্রাকৃতিক বাতাবরণকে নিজেদের প্রয়োজনে বদলে দিয়ে চলেছে ঃ তারা পাথর, জন্তুর হাড়, কাঠ দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করেছে, মাটি, খড় ইট দিয়ে ঘর বানিয়েছে, চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালিয়েছে, বন্য ঘাসের বীজ নির্বাচন করে নীবার ধান্য, গোধূম উৎপন্ন করেছে, নদীতে বাঁধ দিয়ে, কূপ খনন করে জলসেচ দিতে শিখেছে। এই শেখা ঘটেছে মা বাবার কাছ থেকে ছেলেমেয়ের, বন্ধুর কাছ থেকে বন্ধুর, গুরুর কাছ থেকে শিষ্যের। শিক্ষার কথা শ্রুতিতেই শুধু ধরা থাকে নি, পাথরে, কাঠের অথবা পোড়ামাটির ফলকে, শিলাস্তম্ভের উৎকীর্ণ হরফে ভূর্জপত্রের, প্যাপিরাসের, তালপাতার, অথবা চামড়ার পুঁথিতে, সেই শিক্ষার সম্ভার বংশানুক্রমে মানুষের উত্তরাধিকারের অংশ হয়ে গিয়েছে। ক্রমোন্নত উৎপাদন প্রকরণ ও প্রযুক্তির মধ্যেও মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান বস্তুরূপ লাভ করেছে। ব্যক্তি মানুষের মস্তিষ্কই যদি শুধু মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার হত, তাহলে কোটি কোটি শ্রুতিধরের সাহায্যেও আজ মানুষ যত জ্ঞান আহরণ করতে পেরেছে, তারপক্ষে তৎপরিমাণ আহরণ সম্ভব হত না। জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও সামাজিক শ্রমবিভাজন ও তার নানা প্রকরণ ব্যবহার করেই মানবকৃতি এতদূর এগোতে পেরেছে।

মানুষ সামাজিক প্রাণী হওয়ার ফলেই শুধু শিক্ষা এতদূর এগোতে পেরেছে তা-ই নয়, তার শিক্ষাকে আরও গভীর, আরও প্রয়োজনোপযোগী করার জন্যে সমাজ মানুষের পক্ষে অত্যাবশক।

খাদ্যবস্ত্রবাসস্থানের মতোই শিক্ষায় মানুষের জন্মগত অধিকার। শিশু তার প্রথম শিক্ষা তার মা বাবা দিদি দাদা এবং অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বা সঙ্গীর কাছ থেকে পায়। তারপর তার দরকার হয় নানা প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্যের ঃ সেই প্রতিষ্ঠান এককালে ছিলেন পাঠশালার চতুষ্পাঠীর বা মাদ্রাসার গুরুমশাই বা মৌলভীসাহেব, তারপর হয়ে দাঁড়িয়েছেন মাস্টারমশাই, স্যার, মাড্যাম, দিদি সম্বোধনযোগ্য শিক্ষক-

শিক্ষয়িত্রী। নারী সন্তানের সাবালকত্ব পেতে লাগে আঠার বছর ; সেই আঠার বছর পর্যন্ত শিক্ষার অধিকার প্রতি শিশুরই বর্তায়। যে দেশে চারপাঁচ বছর থেকে শিশুকে তার রুজির জন্যে খাটতে হয়, সে অতি দুর্ভাগা দেশ। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে বহু কারণে দুর্ভাগা বলে চিহ্নিত করেছিলেন। শিশুকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা সেই দুর্ভাগ্যের আর এক কলঙ্কচিহ্ন। স্বাধীনতা আমাদের প্রথম সুযোগ দিয়েছিল সমষ্টিগতভাবে আমাদের সকল দুর্ভাগালক্ষণ দূরীকরণের। কিন্তু কলঙ্কমোচনের প্রয়াস আজও থেকে গেছে অতি সীমিত।

শিক্ষার অর্থ কিন্তু শুধু অক্ষরশিক্ষা কিংবা আর্যজ্ঞানের সূত্র মুখস্থ করা নয়। শিক্ষার অর্থ মনকে সর্বদা সজাগ রাখা, যে কোনও শাস্ত্রবাক্যকে প্রশ্ন করার ক্ষমতা রাখা, অধীতজ্ঞানকে নোতুন অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই করার মনোবৃত্তি সদাজাগ্রত রাখা। প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানই হোক, সমাজ সম্বন্ধে ধারণাই হোক, সব রকম বিজ্ঞানই হবে মানুষের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষানিরীক্ষাসজ্ঞাত। যখন সমাজের মধ্যে এই ধরনের প্রশ্ন করার ক্ষমতা লুপ্ত হয় তখন সেই সমাজ বদ্ধজলার মতো রোগের বীজাণু ও শ্যাওলা ভর্তি দুর্গন্ধ পাঁকে নিমজ্জিত হয়।

ভারতবর্ষের সমাজ ও শিক্ষার বিবর্তন বারবার এইরকমভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় দশম শতকে মধ্য এশিয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিদ আলবেরুনি তাঁর ভারতবিদ্যাবিষয়ক মহাগ্রন্থে ভারতীয় দর্শন, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলবিদ্যার অতুলনীয় সারাংশ ও বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু তার সঙ্গে তিনি দেখিয়েছিলেন বহু ভারতীয় মনীষীর লেখায় কীভাবে সত্যিকারের বিজ্ঞানের সঙ্গে কুসংস্কারের সহযোগ ঘটেছিল, কতরকমভাবে পণ্ডিতম্মন্য ব্রাহ্মণরা অজ্ঞানকে জ্ঞান বলে উপস্থাপিত করেছিল, আর কীভাবে তারা অহংকারমত্ত হয়ে ভারতের বাইরের দেশের জ্ঞান আহরণে পরাঙ্মুখ হয়ে পড়েছিল।

ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রারম্ভিক সময়ে এবং বহু পর পর্যন্ত আমরা সমাজের আবার এক শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা লক্ষ্য করি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা একই সংগে আমাদের চোখ বাঁধিয়ে এবং চোখে বারবার ঠুলি পরিয়ে দিয়েছিল। আজও আমরা প্রায়শই ভুলে যাই যে ভারতের চিন্তাজগতে আলোকের মুক্ত ধারার হোতা রাজা রামমোহন রায়ের মনের মুক্তি ঘটেছিল ইস্‌লামসম্পৃক্ত দর্শন ও উপনিষদের সহযোগে ঃ ইউরোপীয় Enlightenment সেই মুক্ত ধারাকে ত্বরান্বিত করেছিল মাত্র।

কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন পরাধীন দেশের অধিকাংশ লোকের মনের ওপর আলোকের ঝরণা বইয়ে দেয়নি ঃ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৫১ সালে শতকরা

প্রায় ৮০ জন লোক ছিল নিরক্ষর। মেয়েপুরুষ ভাগ করলে দেখতে পাই যে, সে সময় চারজন পুরুষের মধ্যে মাত্র একজন সাক্ষর ছিল, আর মেয়েদের মধ্যে তেরজনের মধ্যে মাত্র একজন লিখতে পড়তে পারত। দুই শতকের civilizing mission—এর পরিণতি ছিল এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জনসমষ্টি। ঔপনিবেশিক শাসনের আরেক বিষময় ফল ছিল মানসিক দাসত্ববৃত্তি। যখন যাকে মনিবদেশ বলে মনে হয়েছে, ভারতের শিক্ষিত শ্রেণীর একটা বড় অংশ শুধু তাদের কাছ থেকেই শিক্ষা নিয়েছে, তাদের ভাবাদর্শে নিজেদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর বহুদিন পর্যন্ত আমাদের উচ্চবিত্ত উচ্চশিক্ষিতের দল ব্রিটিশদেরই অনুকরণ করতে চেয়েছে যদিও শিল্পে ও প্রযুক্তিতে ব্রিটেন তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, জাপানের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে। কিছু বামপন্থী রাজনীতিক বা সাধারণ শিক্ষিত লোক যখন ভূতপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমাজতন্ত্রের আদর্শ বলে মনে করেছে, তখন তাদের মনে ঢুকেছে সোভিয়েতমোহ। যারা সেই মোহে পড়েনি তাদের একটা বড় অংশ অন্ধভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভক্ত হয়ে পড়েছে। সেই ভক্তি ইদানীংকালে ভয়াবহ আকার ও আয়তন ধারণ করেছে। আমাদের জাতির বড় বড় মত নির্ধারকরা শুধু যে প্রভুদেশভক্তি থেকে মনকে মুক্ত করে সারা পৃথিবী থেকে জ্ঞান, বিজ্ঞান, অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি, সমাজ গঠনের শিক্ষা নিতে পারে নি তাই নয়, তারা ভুলে গেছে যে অনুকরণ শিক্ষা নয়, চিরকেলে নকলনবিশি থেকে মুন্সিয়ানার ক্ষমতা জন্মায় না।

আমাদের দেশের সার্বিক শিক্ষার একটি বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে বিদেশী ঋণদাতার দল। কাগজে কলমে বিশ্বব্যাঙ্ক বা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বলে শিক্ষার প্রসারের কথা। কিন্তু সরকারের ওপর যে নীতি তারা চাপিয়ে দেয়—এই সব শর্তের উৎসাহী সমর্থক আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই পাওয়া যাবে—তাতে করে সরকারের হাতে শিক্ষা বা সামাজিক স্বস্ত্যয়নের জন্যে খরচ করার টাকা যথেষ্ট থাকে না। তখন ধুয়ো ওঠে উচ্চশিক্ষার জন্যে সরকারি খাতে খরচ একেবারে কমিয়ে দাও, সবাই উচ্চশিক্ষার খরচ যোগাবে নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে। অবশ্যই আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার জন্যে মধ্য বা উচ্চবিত্তের পিছনে প্রচুর অযথা ব্যয় সরকার বহন করে। এখনও অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর দেয় মাইনে থেকে গেছে ১২ টাকা থেকে ২০ টাকা যেখানে সেই ছাত্রের প্রাইভেট টিউশানির জন্যে বাবা মা কয়েক শ' টাকা প্রতিমাসে খরচ করছেন। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন আশু প্রয়োজন। আর প্রয়োজন শিক্ষক সম্প্রদায়ের আরও উন্নত মানের সততা ও দায়বদ্ধতা, যাতে করে শিক্ষক নিজের আসল কাজে ফাঁকি দিয়ে প্রাইভেট টিউশানি থেকে করভারহীন বে-আইনি রোজগার করতে না পারেন বা না চান।

কিন্তু শিক্ষক সম্প্রদায়ের দায়বদ্ধতা ছাড়াও সাধারণ মানুষের শিক্ষার শত্রু হল তার দারিদ্র, সরকার প্রদত্ত সুবিধা বহুলোকের আয়ত্তের মধ্যে না থাকা, এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাদের উদ্দীপনার অভাব। জাতপাত, গ্রাম শহরের মধ্যে পার্থক্য বিশাল নগরকেন্দ্রে সমস্ত সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ার প্রবণতা সবই এখনও সাধারণের শিক্ষার অন্তরায়। পশ্চিমবাঙলায় সরকার চাষীর নির্বিঘ্নে জমি চাষ করার অধিকার দৃঢ়তর করেছে, শিক্ষাখাতে ব্যয় অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। পঞ্চায়েৎপ্রথার সুষ্ঠু ব্যবহার করে গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। কিন্তু তৎসত্বেও পশ্চিমবাঙলার একটা বড় অংশে নিরক্ষরতার হার শতকরা ৫০ ভাগের কাছাকাছি বা বেশী থেকে গিয়েছে—বিশেষ করে কলকাতা থেকে দূরের জেলাগুলিতে শিক্ষার আলো সব চাষী শ্রমিকের ঘরে পৌঁছয় নি। এর পিছনে অনেক কিছুই কাজ করছে—কিন্তু একটা প্রধান বাধা বাঙালীর মধ্যবিত্তের মধ্যস্বত্বভোগীর উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কায়িক শ্রম-বিমুখতা, এবং নিরক্ষর বা সমাজে অনুন্নত গোষ্ঠীর প্রতি অবজ্ঞা। সরকারের সার্বিক সাক্ষরতার অভিযান তখনই পুরোপুরি সফল হবে যখন মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্ত শিক্ষক আমলা ও রাজনৈতিক কর্মীর দল এই মনোভাব কাটিয়ে উঠবে।

আমার জন্ম হয়েছিল মুর্শিদাবাদের এক গ্রামে। সেই গ্রামে তখন একটি ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ডের অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া কোনও স্কুল ছিল না। মাধ্যমিক পড়ার জন্যে আমাকে যেতে হয়েছিল সাত মাইল দূরে বহরমপুরে। এবং তাও সম্ভব হয়েছিল কারণ আমার এক স্নেহময়ী মাসিমার বাড়িতে প্রথমে তিন বৎসর থাকতে পেরেছিলাম। গ্রামের স্কুলে আমার সঙ্গে পড়ত যেসব বন্ধুরা, তাদের অধিকাংশই ছিল চাষীর ঘরের ছেলে। আমার চেয়ে তাদের বুদ্ধি কম ছিল বলে আমি মনে করি না, কিন্তু সুযোগের অভাবে তাদের প্রায় কেউই ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণীর পরে আর লেখাপড়া করতে পারে নি।

সুতরাং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বলতে এসে আমি বিশেষ করে নিজেকে ভাগ্যবান বোধ করছি। কলকাতা বা পাটনা থেকে অনেক দূরদূরান্তের গ্রামগঞ্জ থেকে মেয়েরা এবং ছেলেরা এখন উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবাঙলার এটা একটা মনে ধরার মতো কৃতিত্ব। আমি বিশেষ করে এখানে স্মরণ করি আমাদের দেশের অগণিত বঞ্চিত কন্যা, নারী, গৃহবধূদের কথা। লেখাপড়ায় ঐকান্তিক আগ্রহ ও তুলনীয় মেধা সত্বেও আমার মা এবং আমার মায়ের মতো কোটি কোটি ভারতীয় নারী কোনদিন স্কুলের মুখ দেখেন নি। আজ গ্রামে গ্রামে অন্তত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। সেই সব স্কুল থেকে ছেলেদের সঙ্গে সমান তাল রেখে

মেয়েরা যদি দলে দলে ধাপে ধাপে শিক্ষার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হতে পারে তবেই বহুযত্নে গড়ে তোলা উত্তরবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা পূর্ণতা পাবে বলে আমি মনে করি।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা—উপাচার্য অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে, যাঁর সঙ্গে আমার পারিবারিকসূত্রে আলাপের সুযোগ হয়েছিল। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে জলাজঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে রাজা রামমোহনের নামে এই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের উদ্‌বোধন করিয়েছিলেন। সরকারী আনুকূল্য থাকা সত্ত্বেও চীন-ভারত যুদ্ধের সময় তাঁকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর হস্তক্ষেপ নিবারণ করে সেই চত্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল কায়েম করতে হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই প্রথম যুগে উপাচার্যকে খাতা নিয়ে পরীক্ষকদের বাড়িতে দিয়ে আসতেও আমি দেখেছি। তাঁর সেই সদৃপ্ত প্রচেষ্টা আজ এক বিশাল ও ফলপ্রসূ মহীরুহের আকার নিয়েছে একথা জানলে তিনি নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত বোধ করতেন।

শিক্ষা আমাদের জন্মগত অধিকার কিন্তু সত্যিকারের স্বাধীনতার মতো প্রকৃত শিক্ষাও অনেক নিষ্ঠা ও সংগ্রামের মূল্যে আয়ত্ত করতে হয়। আজ যাঁরা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর সম্মান অর্জন করলেন, তাঁরা তাঁদের নিষ্ঠা, দায়বদ্ধতা ও পরিশ্রম দিয়ে সারাজীবন ধরে সেই ডিগ্রীর মান রাখবেন এই আশা প্রকাশ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।